আইনগত পরিবেশ
Legal Environment

৪

সাধারণত আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, তা নিয়েই পরিবেশ গঠিত। যেমন- মানুষ, গাছ-পালা, পশু-পাখি, ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু প্রভৃতি। এ পরিবেশের মধ্যে থেকেই সকলকে তার নিজস্ব কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হয়। অন্যদিকে, দেশে প্রচলিত আইনকানুন মেনে ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করাকে আইনগত পরিবেশ বলে। একজন ব্যবসায়ী বা শিল্পোদ্যোক্তাকে শিল্প বা ব্যবসায় স্থাপনে দেশের প্রচলিত আইনকানুন মেনে চলতে হয়। সুতরাং দেশের আইনগত পরিবেশ উদ্যোক্তাদের কার্যাবলিকে প্রভাবিত করে থাকে। দেশে প্রচলিত আয়কর আইন, শুল্ক আইন, আমদানি-রপ্তানি নীতি, আর্থিক নীতি প্রভৃতি বিবেচনায় রেখে ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। এ সকল আইনকানুন শিল্প বা ব্যবসায় স্থাপনে অনুকূল হলে দেশে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত হয়; আর প্রতিকূল হলে উদ্যোক্তাগণ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। আইনের সার্বিক প্রয়োগে দেশে অসাধু প্রতিযোগিতা রহিত হয়, ফলে জনগণ ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। দেশে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হয়ে থাকে, যেমন- শ্রমিক আইন, ক্ষতিপূরণ আইন, শ্রমিকসংঘ নীতিমালা, মজুরি আইন, শ্রমঘণ্টা আইন, যৌন হয়রানি নিরোধ আইন প্রভৃতি। অতএব একজন উদ্যোক্তাকে এ সকল আইন কানুনের বিষয়টি মাথায় রেখেই শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে হয়। আর এ সকল আইনকানুন যা শিল্প বা ব্যবসায়কে সরাসরি প্রভাবিত করে থাকে, তাকে আইনগত পরিবেশ বলে। আইনগত পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান রয়েছে; যেমন- সমপরিশোধ আইন, গর্ভবতী বৈষম্য আইন, পরিবার ও শিক্ষাছুটি আইন, যৌন হয়রানি বা উৎপীড়ন আইন প্রভৃতি। এ সকল আইনকানুন মেনে চলতে হয়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৪.১ : আইনগত পরিবেশের সংজ্ঞা; সমপরিশোধ আইন, নাগরিক অধিকার আইন-১৯৬৪ ও ১৯৯১; চাকরির ক্ষেত্রে বয়সের বৈষম্য আইন-১৯৬৭; পুনর্বাসন আইন-১৯৭৩; গর্ভবতী বৈষম্য আইন-১৯৭৮; পরিবার ও চিকিৎসা ছুটি আইন-১৯৯২।

পাঠ-৪.২ : EEOC এর অধীনে কেন্দ্রীয় আইনসমূহের প্রয়োগ; অনুকূল কার্যক্রম; যৌন হয়রানির সংজ্ঞা; ব্যবস্থাপনা সমস্যা; চ্যালেঞ্জসমূহ।

পাঠ-৪.৩ : যৌন হয়রানি ব্যবস্থাপনা কৌশল; বিদেশে জটিলতা; চাকরিতে আইনের ধারা।

পাঠ-৪.১ আইনগত পরিবেশের সংজ্ঞা; সমপরিশোধ আইন; নাগরিক অধিকার আইন-১৯৬৪ ও ১৯৯১; চাকরির ক্ষেত্রে বয়সের বৈষম্য আইন-১৯৬৭; পুনর্বাসন আইন-১৯৭৩; গর্ভবতী বৈষম্য আইন-১৯৭৮; পরিবার ও চিকিৎসা ছুটি আইন-১৯৯২

Key Elements of Law:Equal pay Act; Civil Rights Act of 1964 & 1991; Age Discrimination in Employment Act of 1967; Rehabilitation Act of 1973; Pregnancy Discrimination Act of 1978; Family and Medical Leave Act of 1992

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- আইনগত পরিবেশের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- সমপরিশোধ আইন সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- নাগরিক অধিকার আইন-১৯৬৪ ও ১৯৯১ সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন;
- চাকরির ক্ষেত্রে বয়সের বৈষম্য আইন-১৯৬৭ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- পুনর্বাসন আইন-১৯৭৩ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- গর্ভবতী বৈষম্য আইন-১৯৭৮ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন;
- পরিবার ও চিকিৎসা ছুটি আইন-১৯৯২ সম্পর্কে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আইনগত পরিবেশ বলতে কী বুঝায়?

What is meant by Legal Environment?

সাধারণত: আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, তা নিয়েই পরিবেশ গঠিত। যেমন- মানুষ, গাছ-পালা, পশু-পাখি, ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু প্রভৃতি। এ পরিবেশের মধ্যে থেকেই সকলকে তার নিজস্ব কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হয়। অন্যদিকে, দেশে প্রচলিত আইনকানুন মেনে ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করাকে আইনগত পরিবেশ বলে। একজন ব্যবসায়ী বা শিল্পোদ্যোক্তাকে শিল্প বা ব্যবসায় স্থাপনে দেশের প্রচলিত আইনকানুন মেনে চলতে হয়। সুতরাং দেশের আইনগত পরিবেশ উদ্যোক্তাদের কার্যাবলিকে প্রভাবিত করে থাকে। দেশে প্রচলিত আয়কর আইন, শুল্ক আইন, আমদানি-রপ্তানি নীতি, আর্থিক নীতি প্রভৃতি বিবেচনায় রেখে ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। এ সকল আইনকানুন শিল্প বা ব্যবসায় স্থাপনে অনুকূল হলে দেশে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত হয়, আর প্রতিকূল হলে উদ্যোক্তাগণ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। আইনের সার্বিক প্রয়োগে দেশে অসাধু প্রতিযোগিতা রহিত হয়, ফলে জনগণ ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। দেশে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হয়ে থাকে, যেমন- শ্রমিক আইন, ক্ষতিপূরণ আইন, শ্রমিকসংঘ নীতিমালা, মজুরি আইন, শ্রমঘণ্টা আইন, যৌন হয়রানি নিরোধ আইন প্রভৃতি। অতএব একজন উদ্যোক্তাকে এ সকল আইন-কানুনের বিষয়টি মাথায় রেখেই শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে হয়। আর এ সকল আইনকানুন যা শিল্প বা ব্যবসায়কে সরাসরি প্রভাবিত করে থাকে, তাকে আইনগত পরিবেশ বলে।

আইনের প্রধান উপাদানসমূহ

Key Elements of Law

আইনের প্রধান উপাদানসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো:

(ক) সমপরিশোধ আইন

Equal Pay Act

চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য থেকে শ্রমিকদেরকে রক্ষা করার জন্য সমপরিশোধ আইন পাশ করা হয় মার্কিন কংগ্রেসে। ১৯৬৩ সালে এ আইনটি পাশ করা হয়। যে সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে দক্ষতা, প্রচেষ্টা ও দায়িত্ব প্রভৃতির দরকার হয় এবং একই কার্য পরিবেশে কাজ করতে হয়, সে সকল ক্ষেত্রে মজুরি বৈষম্য পরিহার করা হয়েছে এ আইনে।

তবে এ আইনে চারটি ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে, যেমন–

(i) যেখানে চাকরির জ্যেষ্ঠতা বিচারে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, সেখানে পুরুষ জ্যেষ্ঠ হলে পারিশ্রমিক বেশি পাবে।

(ii) কার্যসম্পাদনের মান অনুযায়ী পারিশ্রমিক দেওয়া হলে, তা আইনসম্মত হবে। অর্থাৎ কোনো পুরুষ যদি মহিলার তুলনায় গুণগত কার্যসম্পাদন করে, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক মজুরি বেশি পাবে।

(iii) উৎপাদনের পরিমাণ বিবেচনায় পারিশ্রমিকের পার্থক্য হতে পারে। এটিকে Piece-rate system বলা হয়। অর্থাৎ পুরুষ মহিলার চেয়ে বেশি উৎপাদন করলে, পারিশ্রমিক বেশি পাবে।

(iv) সর্বোপরি কার্যক্ষেত্রের উপাদানের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ কার্যক্ষেত্রের পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনায় পুরুষ বা মহিলা যে কেউ পারিশ্রমিক বেশি পেতে পারে। এটি মালিক কর্তৃক নির্ধারিত হবে। এটিকে বলা হয় “Factors other than Sex”।

(খ) নাগরিক অধিকার আইন-১৯৬৪
Civil Rights Act of 1964

১৯৬৪ সালে মার্কিন কংগ্রেসে নাগরিক অধিকার আইন-১৯৬৪ পাস করা হয়। এ আইনে কতগুলো সেকশন রয়েছে সেগুলোকে টাইটেল (title) বলা হয়। যেমন- টাইটেল-VII হলো চাকরিসংক্রান্ত। এটি চাকরিদাতা, পলিসিমেকার, আইন ও জুডিশিয়ারির সদস্যদের নিকট “Title-VII” নামে পরিচিত।

এ আইনে জাতি, বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ, জাতীয়তাভেদে চাকরিতে বৈষম্য করা নিষেধ করা হয়েছে। চাকরির অবস্থান বলতে বুঝানো হয়েছে- কর্মী নিয়োগ, ছাঁটাই, পদোন্নতি, বদলি, পারিশ্রমিক, বেতন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ভর্তি প্রভৃতি। এ সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য করা যাবে না। এ আইনটি সকল প্রাইভেট ও পাবলিক প্রতিষ্ঠানের জন্যই প্রযোজ্য। এমনকি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এটি প্রযোজ্য। এ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না তা পরিবীক্ষণ করার জন্য গঠন করা হয় The equal employment opportunity commission (EEOC) ।

(গ) চাকরির ক্ষেত্রে বয়সের বৈষম্য আইন-১৯৬৭
Age Discrimination In Employment Act of 1967

যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬৭ সালে চাকরিতে বয়ঃসীমা উঠিয়ে দিয়ে আইন পাস করা হয় যা ‘Age Discrimination in Employment Act of 1967’-নামে অভিহিত। এখানে বলা হয়েছে যে, কোনো কর্মীর বয়স ৪০ বা তদোর্ধ্ব হলেই চাকরি পাবে না, তা নয়। এটি এ আইনে রহিত করা হয় এবং অবসরে যাওয়ার ক্ষেত্রে নির্ধারিত বয়ঃসীমাও উঠিয়ে দেওয়া হয়। তবে কিছু কিছু পেশায় অবসর সীমা অনুমোদন দেওয়া হয়; যেমনঃ জনগণের নিরাপত্তা নিয়ে যারা কাজ করে। তাদের ক্ষেত্রে অবসর সীমা প্রযোজ্য। এ আইনটি ১৯৯০ সালে সংশোধন করা হয় “Older workers protection Act” নামে। এখানে বলা হয় যে, মালিকপক্ষ ইচ্ছা করলেই বয়স্ক কর্মীদেরকে ছাটাই করতে পারবে না এবং বৃদ্ধ বয়সে কোন সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে মালিকপক্ষ কোনো waiver বা সুবিধা নেওয়ার জন্য কর্মীদের নিকট হতে সই নিতে পারবে না। EEOC এটি পরিবীক্ষণ করে থাকে।

(ঘ) পুনর্বাসন আইন-১৯৭৩
Rehabilitation Act of 1973

এ আইন দ্বারা প্রতিবন্ধী (Handicap) কর্মীদের প্রতি বৈষম্য নিরোধ করা হয়। তবে অধিকাংশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ এর আওতার বাইরে রয়ে গেছে। প্রতিবন্ধী কারা সে সম্পর্কে বলা হয়েছে- (i) যে ব্যক্তির অঙ্গহানি সীমিত বা সাম্প্রতিক সমস্যা অথবা মানসিক সমস্যার কারণে স্বাভাবিক জীবনের কাজ-কর্ম সীমিত হয়ে পড়েছে। (ii) যে ব্যক্তির অঙ্গহানির ইতিহাস বা রেকর্ড আছে। (iii) যে ব্যক্তি অঙ্গহীন বা প্রতিবন্ধী হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে এ আইনে বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও কানো রকম বৈষম্যের সুরক্ষা ব্যতীত যদি অন্য কোনো যোগ্যতা দিয়ে

তার দায়িত্ব পালন করতে পারে তা হলে মালিকপক্ষকে যৌক্তিকভাবে সে সুযোগ করে দিতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে, যৌক্তিকতা নির্ভর করবে পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর।

(ঙ) গর্ভবতী বৈষম্য আইন-১৯৭৮
Pregnancy Discrimination Act of 1978

এই আইনের মাধ্যমে মালিকপক্ষকে বলা হয়েছে যে, গর্ভবতী মহিলাদের প্রতি বৈষম্য করা যাবে না এবং গর্ভকালীন সময়ে ছুটি মঞ্জুর করতে হবে, অন্য যে কোনো চিকিৎসাকালীন অবস্থার মতোই। এতে আরো বলা হয়েছে যে, গর্ভবতী মেয়েরা কাজে যোগদান করলে তাদেরকে পুনরায় বহাল করার প্রয়োজন নেই এবং চাকরিদাতারা ছুটি গণনা করতে পারবে না। মালিকগণ তাদেরকে পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

(চ) নাগরিক অধিকার আইন-১৯৯১
Civil Rights Act of 1991

মার্কিন কংগ্রেসে “Title VII”- এর অধীনে ব্যক্তির অধিকার সম্প্রসারণ করা হয়েছে। নতুন আইনটি হলো Civil Rights Act of 1991। এতে চারটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ের কথা বলা হয়েছে, যেমন- (i) ফেডারেল সরকারের কর্মীদের “Title VII”-সংরক্ষনের সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। (ii) এতে কর্মীরা ক্ষতিপূরণ ও শাস্তির জন্য সংঘটিত ক্ষতি যেমন- বেতন, সুবিধাদি ও এটর্নিদের ফিস ইত্যাদি ফেরত পাওয়ার জন্য মামলা করতে পারবে। (iii) অবৈধ বৈষম্য সম্পর্কে উপস্থাপিত দাবিসমূহ যে মিথ্যা তা মালিকদেরকে কোর্টের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে। (iv) বিদেশগামী কর্মীদেরকে সুরক্ষা দিতে হবে যদি না প্রমাণিত হয় যে, সংশ্লিষ্ট কর্মী কোনো সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সাথে জড়িত।

(ছ) পরিবার ও চিকিৎসা ছুটি আইন-১৯৯২
Family and Medical Leave Act of 1992

পরিবার ও চিকিৎসা ছুটি আইন-১৯৯২ অনুসারে মালিক তার কর্মীদেরকে সন্তান জন্মদান, সন্তান ধারণ, শিশুর অসুস্থতা, পরিবারের অন্য কারো অসুস্থতা কিংবা কর্মীর নিজের অসুস্থতা প্রভৃতি কারণে বছরে ১২ সপ্তাহ পর্যন্ত বিনা বেতনে ছুটি মঞ্জুর করবেন। এটি সেই সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য যেখানে কমপক্ষে ৫০ জন কর্মী কাজ করে। আর সেই সকল কর্মী এ সংরক্ষণ সুবিধা পাবেন যারা সপ্তাহে কমপক্ষে ১২ ঘন্টা কাজ করার সুযোগ লাভ করে এক বছরে অথবা বছরে মোট ১২৫০ ঘন্টা আর উচ্চ বেতনধারী কর্মীগণ FMLA এর সুবিধা পাবেন না।

ছুটি চলাকালীন সময়ে মালিককে দলগত স্বাস্থ্যবিমা চালিয়ে যেতে হবে এবং কর্মীরা অবশ্যই ছুটি শেষে পূর্বের পদে যোগদানের সুযোগ পাবে। এ ছাড়াও কোনো মালিক এর চেয়ে বেশি কিছু দিতে চাইলে তা দিতে পারবে। যেমন- আরো লম্বাছুটি, সবেতন ছুটি অথবা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা; যেমনঃ ছুটি শেষ হয়ে গেলেও বাড়িতে বসে অফিসের কাজ করার ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ :	সমপরিশোধ আইন, নাগরিক অধিকার আইন-১৯৬৪ ও ১৯৯১, চাকরির ক্ষেত্রে বয়সের বৈষম্য আইন-১৯৬৭ সম্পর্কে খাতায় লিখুন এবং আমাদের দেশে প্রচলিত আইনের সাথে তুলনা করুন।

সারসংক্ষেপ:

চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য থেকে শ্রমিকদেরকে রক্ষা করার জন্য সমপরিশোধ আইন প্রচলন করা হয়েছে। এ আইন দ্বারা যে সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে দক্ষতা, প্রচেষ্টা, দায়িত্ব প্রভৃতির দরকার হয় এবং একই কার্য পরিবেশে কাজ করতে হয়, সে সকল ক্ষেত্রে মজুরি বৈষম্য পরিহার করা হয়েছে। ১৯৬৪ সালে মার্কিন কংগ্রেসে নাগরিক অধিকার আইন-১৯৬৪ পাস করা হয়। এ আইনে কতকগুলো সেকশন রয়েছে সেগুলোকে টাইটেল (title) বলা হয়। যেমন- টাইটেল-VII হলো চাকরিসংক্রান্ত। এটি চাকরিদাতা, পলিসিমেকার, আইন ও জুডিশিয়ারির সদস্যদের নিকট "Title-VII" নামে পরিচিত। এ আইনে জাতি, বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ, জাতীয়তাভেদে চাকরিতে বৈষম্য করা নিষেধ করা হয়েছে। চাকরির অবস্থান বলতে বুঝানো হয়েছে- কর্মী নিয়োগ, ছাঁটাই, পদোন্নতি, বদলি, পারিশ্রমিক বেতন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ভর্তি প্রভৃতি। এ সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য করা যাবে না। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬৭ সালে চাকরিতে বয়ঃসীমা উঠিয়ে দিয়ে আইন পাস করা হয়, যা 'Age Discrimination in Employment Act of 1967'-নামে অভিহিত। এখানে বলা হয়েছে যে, কোনো কর্মীর বয়স ৪০ বা তদোর্ধ্ব হলেই চাকরি পাবে না, তা নয়। এটি এ আইনে রহিত করা হয় এবং অবসরে যাওয়ার ক্ষেত্রে নির্ধারিত বয়ঃসীমাও উঠিয়ে দেওয়া হয়। এ আইন দ্বারা প্রতিবন্ধী (Handicap) কর্মীদের প্রতি বৈষম্য নিরোধ করা হয়। তবে অধিকাংশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ এর আওতার বাইরে রয়ে গেছে। প্রতিবন্ধী কারা সে সম্পর্কে বলা হয়েছে– (i) যে ব্যক্তির অঙ্গহানি বা শারীরিক সমস্যা অথবা মানসিক সমস্যার কারণে স্বাভাবিক জীবনের কাজ-কর্ম সিমিত হয়ে পড়েছে। (ii) যে ব্যক্তির অঙ্গহানির ইতিহাস বা রেকর্ড আছে। (iii) যে ব্যক্তি অঙ্গহীন বা প্রতিবন্ধী হিসেবে বিবেচিত হয়। পরিবার ও চিকিৎসা ছুটি আইন-১৯৯২ অনুসারে মালিক তার কর্মীদেরকে সন্তান জন্মদান, সন্তান ধারণ, শিশুর অসুস্থতা, পরিবারের অন্য কারো অসুস্থতা কিংবা কর্মীর নিজের অসুস্থতা প্রভৃতি কারণে বছরে ১২ সপ্তাহ পর্যন্ত বিনা বেতনে ছুটি মঞ্জুর করবেন। এটি সেই সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য যেখানে কমপক্ষে ৫০ জন কর্মী কাজ করে।

পাঠ-৪.২ EEOC এর অধীনে কেন্দ্রীয় আইনসমূহের প্রয়োগ; অনুকূল কার্যক্রম; যৌন হয়রানির সংজ্ঞা; ব্যবস্থাপনা সমস্যা; চ্যালেঞ্জসমূহ

Enforcement of Federal Law Under EEOC; Affirmative Action, Sexual Harassment; Problems in Managing Sexual Harassment; Problems & Challengs in Managing Sexual Harassment

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- EEOC এর অধীনে কেন্দ্রীয় আইনসমূহের প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- EEOC এর অনুকূল কার্যক্রম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- যৌন হয়রানির সংজ্ঞা, ব্যবস্থাপনা সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

EEOC-এর অধীনে কেন্দ্রীয় আইনসমূহের প্রয়োগ

Enforcement of Federal Law Under EEOC

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রণীত শ্রম আইনের বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য EEOC গঠন করা হয়েছে। যে কোনো ব্যক্তি যদি মনে করে যে, কর্মক্ষেত্রে তাদের অধিকার ক্ষুন্ন করা হয়েছে বা "Title VII"- ভঙ্গ করা হয়েছে, তা হলে EEOC-এর নিকট লিখিত অভিযোগ করতে পারে এবং এ অবস্থার সমাধান দাবি করতে পারে। বৈষম্য আইন অনুযায়ী ১৮০ দিনের মধ্যে অভিযোগ নথি পেশ করতে হয়। এটি EEOC অফিসে বা স্টেট বা স্থানীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নিকট নথি পেশ করা যায়। EEOC অভিযোগ পাওয়ার পর অনুসন্ধান করে অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে। অভিযোগের সত্যতা না পেলে এটি এখানেই শেষ করে দেওয়া হয়। আর সত্যতা পাওয়া গেলে মালিককে নোটিশ দেওয়া হয় অভিযোগ নিরসনের জন্য। EEOC এ ক্ষেত্রে অভিযোগকারীর সাথে কথাবার্তা বলে নির্ধারণ করে থাকে যে সুষ্ঠু সমাধানের জন্য কী করণীয়। অতঃপর মালিকের সাথে সমন্বয় চুক্তি করে থাকে। যদি মালিক EEOC কে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে EEOCমালিকের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিতে পারে। এ প্রক্রিয়াটি নিচে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো:

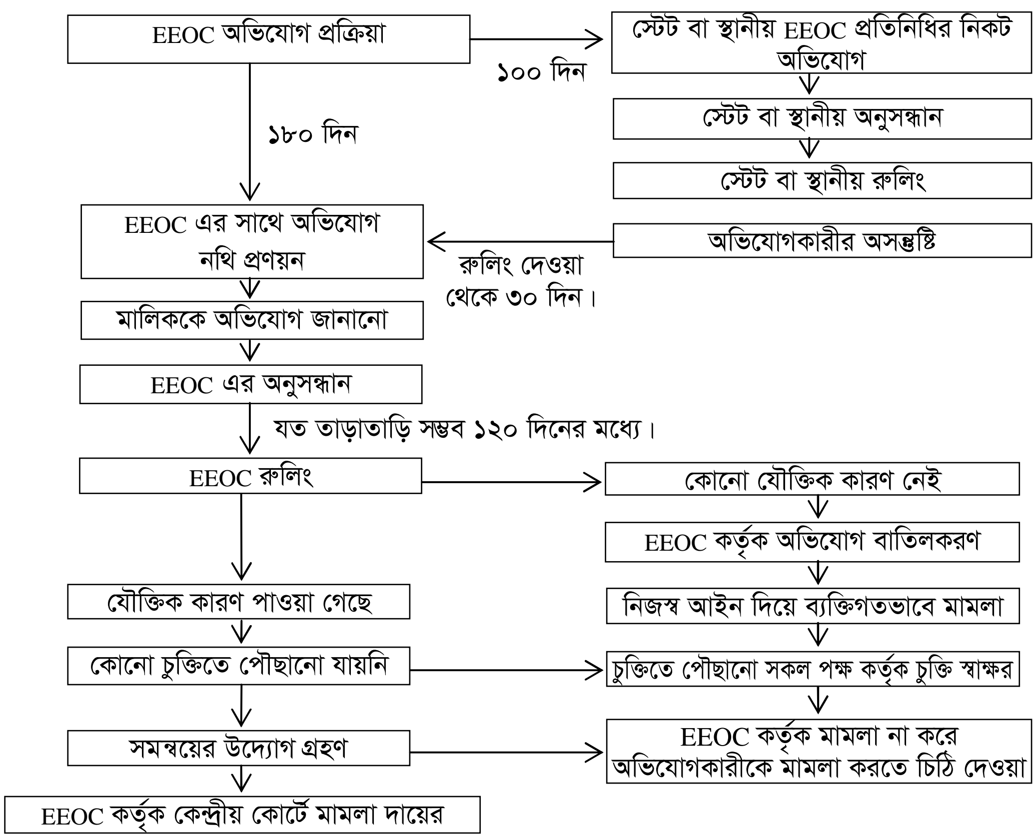

চিত্র : EEOC কর্তৃক অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া

বয়স, জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম, জাতীয়তা বা অক্ষমতা প্রভৃতি অনুসারে কর্মীরা যখন বিবেচিত হয়, তখনই বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। অবশ্য বৈষম্যের প্রভাব নগন্য। প্রত্যেকের জন্য সমান মান বা আচরণ প্রয়োগ করা হলেও দেখা যায় যে, বিভিন্ন দলের কার্যসম্পাদনের ফলাফল বিভিন্ন রকমের।
অভিযোগকারী যদি বৈষম্যের প্রভাব উপস্থাপন করতে পারে, তা হলে কর্মীরা যে বৈষম্যের শিকার হয়নি, তা প্রমাণের দায়িত্ব মালিকের। চার উপায়ে মালিক তা প্রমাণ করতে পারে :

প্রথমত : চাকরি সম্পর্কিত কারণ দেখাতে পারে। এ ক্ষেত্রে মালিক কর্মী নিয়োগের যে নিয়ামক ও বাছাই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে নির্দিষ্ট কাজের জন্য মালিক তা উল্লেখ করতে পারে।

দ্বিতীয়ত : মালিক এ ক্ষেত্রে স্বীকৃত পেশাগত যোগ্যতা (Bona Fide Occupational Qualification (BFOQ)) উল্লেখ করতে পারে। এতে বলা হয় যে, কেন একজন কর্মীকে নির্দিষ্ট দলের অন্তর্ভুক্ত হতে হয়। এ দল বলতে বুঝানো হয়েছে লৈঙ্গিক ও ধর্মীয় বৈষম্যকে। উদাহরণ স্বরূপ- পুরুষদের লকার রুমে নারীদের এ্যাটেন্ডডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যায় না আবার, এয়ারলাইনস কোম্পানি ফ্লাইট এ্যাটেন্ডডেন্ট হিসেবে পুরুষদেরকে নিয়োগ দিতে চায় না। কারণ এ পদে যাত্রীদের পছন্দ হলো নারী। এ ক্ষেত্রে “Title VII”-এর শর্ত ভঙ্গ হচ্ছে।

তৃতীয় : যুক্তিটি হলো স্বীকৃত জ্যেষ্ঠতা। সর্বত্রই জ্যেষ্ঠতাকে অনুসরণ করা হয়। কোর্টও তাই পরামর্শ দেয়। এ ক্ষেত্রে বৈষম্য হয় না। তবে সিস্টেম হতে হবে যৌক্তিক ও অন্যান্য বৈষম্যহীন।

চতুর্থ : যুক্তিটি হলো “ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা”। এ ক্ষেত্রে মালিককে দেখাতে হবে যে, যে ব্যবস্থাটি গ্রহণ করা হয়েছে, তা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ও দক্ষতার জন্য নেওয়া হয়েছে। কোর্ট অবশ্য ব্যবসায়ের মুনাফা যোগ্যতা বা অর্থনৈতিক বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছে যে, প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও ক্রেতাদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

অনুকূল কার্যক্রম
Affirmative Action

অনুকূল কার্যক্রম ধারণায় বলা হয়েছে যে, অতীতে চাকরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈষম্য ছিল যা দূর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেন বৈষম্য দূর হয়। অনুকূল কার্যক্রমের জন্য প্রতিষ্ঠানকে নিশ্চিত করতে হবে যে, তাদের কার্যশক্তি সমাজের প্রতিনিধি, যেখানে ব্যবসায় পরিচালিত হয়। অনুকূল কার্যক্রম (Affirmative Action) ধারণা পোষণ করে সেই প্রতিষ্ঠানসমূহ, যে প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মীকে যথাযথভাবে সমানভাবে বিবেচনায় আনতে পারেনি। তাই একটিমাত্র উপায় হলো অতীতের বৈষম্য সংশোধন করে তাদেরকে সমভাবে বিচার করতে হবে এবং চাকরির সুযোগ দিতে হবে।

এদিকে, সমচাকরির সুযোগ (EEO) মতবাদে বলা হয় যে, প্রতিষ্ঠানকে বৈষম্যহীন কর্মপরিবেশ দিতে হবে। তবে এটি বলে না যে, প্রতিষ্ঠানকে অতীতে ফিরে যেতে হবে এবং বৈষম্য সংশোধন করতে হবে। EEO তে ধারণা দেওয়া হয় যে, যে কোনো উদ্যোগে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে হবে এবং বৈষম্যহীন সমাজ ও কার্যক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। সংক্ষেপে EEO এর যুক্তি হলো: “দুটি ভুল সঠিক বস্তু তৈরি করতে পারে না” (Two wrongs do not make things right) ।

যৌন হয়রানি বা উৎপীড়ন
Sexual Harassment

১৯৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট Meritor Savings Bank Vs Vinson মামলায় বলে যে, যৌন হয়রানি “Title VII”-এর আওতায় যৌন বৈষম্য সৃষ্টি করছে। তখন থেকে যৌন হয়রানি পরিস্থিতি এমন অবস্থার সৃষ্টি করে, যেখানে একজন লোক একজন মহিলাকে যৌন উৎপীড়ন করে যিনি ঐ ব্যক্তির নিচের পদে বা সমপদে চাকরি করেন। ১৯৯৮ সালে উচ্চ আদালত আবারো Oncale Vs Sundow her offshore, Inc.-এর মামলায় বলে যে, একই লিঙ্গেঁর মধ্যে যৌন হয়রানি “Title VII”-এর আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য প্রতিবছর প্রতিষ্ঠান কর্মীদের এ জন্য অনেক অর্থ জরিমানা হিসেবে প্রদান করে। এটি শুধু অর্থের ক্ষতি তাই নয়, বরং এতে কর্মিসম্পর্ক এবং কর্মীদের নৈতিকতা নষ্ট করে দেয়। যৌন হয়রানি দিনে দিনে বেশ জটিল আকার ধারণ করে এজন্য যে, ক্রমবর্ধনশীল যুবক-যুবতীরা কার্যক্ষেত্রে যৌনতার দিকে ধাবিত হয়। সুতরাং যৌন নিপীড়নের বিষয়টি মালিকদের নিকট একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যৌন হয়রানি কী?

What is Sexual Harassment Is?

কোর্ট বিভিন্ন সময়ে ধারণা চিহ্নিত করেছে যা আচরণকে যৌন হয়রানিতে প্রভাবিত করে। যৌন হয়রানির দিকে প্রথম অগ্রসর হওয়াটা স্বাগতম না জানানো প্রকৃতির। যৌন হয়রানির বিষয়টি উহ্য বা অপ্রকাশিত থাকে। যাকে নিপীড়নের জন্য লক্ষ্য করা হয়। তাকে বা তাদেরকে বুঝানো হয় যে, এটি হলো অপরাধমূলক ও অযৌক্তিক কাজ। দুজনকে এ জ্ঞান দেওয়া হলে একজন হয়ত সত্যিই এটিকে অপরাধমূলক কাজ মনে করবে, অন্যজন এটিকে গ্রহণযোগ্য কাজ মনে করতে পারে। এটি হলো একটি আত্মগত ব্যাপার যা প্রকাশ করা একটা বোঝা হিসেবে গণ্য হয়।

দ্বিতীয় ধারণাটি হলো নিপীড়নের প্রকৃতি সম্পর্কে। কোর্ট দুধরনের নিপীড়ন চিহ্নিত করেছে। একটি হলো- Quid Pro Quo, অন্যটি হলো বৈরী পরিবেশ (Hostile environment) । Quid Pro Quo- হলো ল্যাটিন শব্দ, যার অর্থ হলো- 'এটি হলো ওটার জন্য' (This for that) । অর্থাৎ এখানে যৌন উৎপীড়নকারী সংশ্লিষ্ট কর্মীকে ভয়ভীতি দেখিয়ে কিংবা গিফট দিয়ে অর্থাৎ একটা কিছু বিনিময় করে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। যদি যৌনতাকে প্রত্যাখ্যান করে তা হলে শাস্তির ভয় দেখানো হয়। আর অধিকাংশের মতে বৈরী পরিবেশে যৌন হয়রানি বা উৎপীড়ন হলো খুব সূক্ষ্ম প্রকৃতির। কার্যপরিবেশ যদি বৈরী হয় অর্থাৎ যৌনতা সংঘটিত হওয়ার মতো হয়, তা হলে তো সেখানে এটি ঘটবেই। তাই এক্ষেত্রে মালিকদের পক্ষে চিহ্নিতকরণ কষ্টকর হয়ে পড়ে যে, কার দ্বারা, কখন, কোথায়, কার সাথে যৌন নিপীড়ন করা হয়েছিল।

তবে একটি বিষয় নিবিড় পরিবেশের ক্ষেত্রে জানা গেছে যে, এ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে যৌনকর্ম সংঘটিত হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে সম্মতিসূচক যৌন সম্পর্ক গড়ে উঠে। অনেক মালিক এটি বলেই তার দায় এড়িয়ে যান যে, যখনই সম্মতিসূচক সম্পর্ক তৈরি হয় তখনই ব্যবস্থাপক বা তত্ত্বাবধায়কগণ তাদের ক্ষমতা দেখিয়ে অধীনস্তদের সাথে যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলে। তখন এটি আর অসৌজন্যমূলক বা অস্বাভাবিক বিষয় থাকে না। বস্তুত যারা এটিকে স্বাগত না জানায় তারা সহজেই এ বিষয়ে কেস ফাইল করতে পারে যৌন উৎপীড়কের বিরুদ্ধে।

কার্য পরিবেশের নিরাপত্তার জন্য বা অনিশ্চয়তা দূর করার জন্য "অপরাধমূলক" (offensive) ও "যৌক্তিক নারী" (Reasonable Women) মান (Standard) কোর্ট কর্তৃক ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক সময় নারীদের অভিযোগ ন্যায্যতা পায় না। তখন কোর্ট বিষয়গুলো খতিয়ে দেখে যে, কার্য পরিবেশ সত্যিই অপরাধ সংঘটিত হওয়ার মতো ছিল কিনা।

সর্বশেষে বলা যায় যে, যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে বহু কথাবার্তা রয়েছে, কর্মীদের পক্ষে যা প্রমাণ করা দুরূহ ব্যাপার। অভিযোগ পরীক্ষাযোগ্য হতে হবে। এ সংক্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যায় প্রত্যক্ষদর্শীদের নিকট থেকে লিখিত দলিল হতে। সুতরাং বাস্তবতার প্রেক্ষিতে এ অভিযোগ গ্রহণ ও পরীক্ষানিরীক্ষা পূর্বক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

যৌন হয়রানি ব্যবস্থাপনায় সমস্যা

Problems and Challenges in Managing Sexual Harassment

যৌন নিপীড়ন ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠানকে চারটি নির্দিষ্ট সমস্যা নিয়ে কাজ করতে হয়। **প্রথমত,** শ্রমিক-কর্মী ও ব্যবস্থাপকগণ সচেতন নয় যে, যৌন নিপীড়ন কী এবং কীভাবে নিপীড়ন বা হয়রানির সৃষ্টি হয়। এ সকল সমস্যা দূর করতে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাপনা চ্যালেঞ্জ হাতে নিতে হবে। যৌন নিপীড়ন সম্পর্কে কর্মীদের মধ্যে বিভিন্ন ধারণা প্রচলিত আছে এবং অপরাধের মান কী হবে। তাই যৌন নিপীড়ন চিহ্নিত করা খুব কঠিন কাজ এবং যিনি বা যারা নিপীড়নের শিকার তাদের বর্ণনার ধরনের উপর নিপীড়কদের নিপীড়নে জড়িত থাকার বিষয়টি নির্ভর করে।
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ সকল চ্যালেঞ্জসমূহ ফলপ্রসূভাবে অতিক্রম করা যায়। কার্যক্ষেত্রে সতর্কতা ও যৌন সংক্রান্ত আচরণ সম্পর্কে পুরুষ ও নারী কর্মীদের নিকট আলাপ আলোচনা করতে হবে। ধারণাসমূহ সকলের মধ্যে শেয়ার করতে হবে এবং কর্মীদের নিকট ও ব্যবস্থাপকদের নিকট স্বচ্ছভাবে প্রচার করতে হবে যে, কী ধরনের আচরণ যৌন নিপীড়নের মধ্যে পড়ে।

দ্বিতীয় সমস্যাটি হলোঃ যৌন হয়রানি রোধ করার জন্য প্রতিষ্ঠানের পলিসি থাকতে পারে কিন্তু অনেক কর্মী হয়ত এটি সম্পর্কে অসতর্ক কিংবা অনেকে জানেই না এতে কী লেখা আছে। এ সমস্যা মোকাবিলা করতে ব্যবস্থাপনা যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়, তা হলো প্রতিটি অভিযোগ একই ধরনের। যে কোনো প্রতিষ্ঠিত নীতির প্রয়োগে মিল থাকে কিন্তু ঘটনার

পরিবর্তনশীলতা ও বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনাকে নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যায় ফেলে দেয়। এ বিষয়টি প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণ এটির প্রক্রিয়া ও পলিসির ওপর জোর দেয়। কর্মীদের জানা প্রয়োজন বাস্তবে যৌন নিপীড়নের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানের অবস্থান কী এবং কীভাবে এটি প্রয়োগ করা হয়। যাই হোক, প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে এটির সফল প্রয়োগ করা যেতে পারে।

যৌন নিপীড়ন ব্যবস্থাপনার **তৃতীয়** সমস্যা হলো কর্মীরা যৌন নিপীড়নের ঘটনা সম্পর্কে রিপোর্ট করতে ভয় পায়। প্রায় অর্ধেক কর্মীর অবস্থা এ রকম যে, যৌন নিপীড়ন সম্পর্কে রিপোর্ট করার অর্থ ক্ষমতাবানের সাথে অথবা সরাসরি সুপার ভাইজারের সাথে সংঘর্ষে যাওয়া। কর্মীদের জানা প্রয়োজন যে, তাদের অভিযোগ গুরুত্বসহকারে নেওয়া হবে। যদিও “Title-VII” তে কঠোরভাবে বলা হয়েছে যে, অভিযোগকারী কোনো কর্মীর সাথে দুর্ব্যবহার করা যাবে না। তবে একজন সুপারভাইজারের পক্ষে বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে একজন কর্মীর জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলা কোন ব্যাপারই না। কর্মীরা অনেক সময় মনে করে যে, প্রতিষ্ঠানকে চ্যালেঞ্জ করার প্রস্তাবটি ক্ষতিকর। কারণ প্রতিষ্ঠানটি বড়, ক্ষমতাধর, সম্পদশালী। এ বিষয়টি তদন্তকারীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি কর্মীরা প্রক্রিয়াটিকে বা তদন্তকারীকে অবিশ্বাস করে যে, তারাই নিপীড়নকে উৎসাহিত করছে। তা হলে এটি প্রতিষ্ঠানের জন্য ভালো হবে না। সুতরাং প্রতিষ্ঠানে বিশ্বাসের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেন তারা নির্ভয়ে চাকরি চালিয়ে যেতে পারে।

চতুর্থ সমস্যা হলো- কীভাবে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ সবচেয়ে উত্তম উপায়ে তদন্ত করা যায়। এটি ফলপ্রসূভাবে করার চ্যালেঞ্জ হলো ঘটনার দুটি দিকই আছে। দেখা গেল যে, ঘটনার সাক্ষী ও প্রমাণ কোনোটিরই লিখিত দলিল নেই। তদন্তকে চালিয়ে নেয়ার জন্য অন্যান্য কর্মীদেরকেও জিজ্ঞাসা করতে হবে যাদের এ ব্যাপারে জানা আছে। অভিযোগের দ্রুত তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। এতে কর্মীদের মনে অনুকূল ধারণার জন্ম হবে এবং পুনরায় নিপীড়নের ঘটনা ঘটবে না।

নিচে তালিকার মাধ্যমে সংক্ষেপে যৌন নিপীড়নের ব্যবস্থাপনা সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সমূহ তুলে ধরা হলো:

সমস্যাসমূহ	চ্যালেঞ্জসমূহ	কৌশলসমূহ
• শ্রমিকগণ বা ব্যবস্থাপকগণ কেউই নিশ্চিত নন এটা কী?	• ধারণাসমূহ • চিহ্নিত করা কঠিন • অযৌক্তিক মনোভাব • ব্যাখ্যা প্রয়োজন	• প্রশিক্ষণ • নারী ও পুরুষের মধ্যে আলোচনা • দক্ষতা নয়; সতর্কতা ও মনোভাব
• শ্রমিকগণ পলিসি সম্পর্কে অসতর্ক বা তারা জানে একটি পলিসি আছে, কিন্তু জানে না যে, তাতে কী লিখা আছে।	• প্রয়োগে মিল থাকা প্রয়োজন (কর্মীদের আইনগত ও ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য) কিন্তু বাস্তবায়নে ঢিলেঢালা ভাব (বিশেষ অবস্থায় মামলা)	• প্রশিক্ষণ • পলিসি ও প্রক্রিয়ার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।
• রিপোর্ট করতে ভয়	• পাল্টা দুর্ব্যবহার • তদন্তকারীর প্রভাবিত হওয়া	• বিশ্বাসের পরিবেশ সৃষ্টি • পক্ষপাতিত্বহীন তদন্ত, বাহ্যিক উৎস ব্যবহার • গোপনীয়তা • অভিযোগকারীদেরকে সমর্থন দেওয়া
• কীভাবে তদন্ত করতে হবে	• প্রতিটি ঘটনার দুটি দিক রয়েছে। • প্রায় সময়ই বাহিরের সাক্ষী নেওয়া হয় না।	• অন্য ঘটনা থেকে বা অন্যদের থেকে ঘটনার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা • ইস্যুটি তাজাবস্থায় দ্রুত তদন্ত করা • কোনো প্রমাণ না পাওয়া গেলে অভিযুক্তকে চিঠি দিয়ে জানানো যে, এরকম ব্যবহার করা হলে, তা হতো যৌন নিপীড়ন

তালিকা: যৌন নিপীড়ন ব্যবস্থাপনার সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

শিক্ষার্থীর কাজ :	EEOC কী? যৌন হয়রানির সংজ্ঞা, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রণীত শ্রম আইনের বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য EEOC গঠন করা হয়েছে। যে কোনো ব্যক্তি যদি মনে করে যে, কর্মক্ষেত্রে তাদের অধিকার ক্ষুন্ন করা হয়েছে বা "Title VII" ভঙ্গ করা হয়েছে, তা হলে EEOC এর নিকট লিখিত অভিযোগ করতে পারে এবং এ অবস্থার সমাধান দাবী করতে পারে। বৈষম্য আইন অনুযায়ী ১৮০ দিনের মধ্যে অভিযোগ নথি পেশ করতে হয়। EEOC অফিসে বা স্টেট বা স্থানীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নিকট এ নথি পেশ করা যায়। EEOC অভিযোগ পাওয়ার পর অনুসন্ধান করে অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে। অভিযোগের সত্যতা না পেলে এটি এখানেই শেষ করে দেওয়া হয়। আর সত্যতা পাওয়া গেলে মালিককে নোটিশ দেওয়া হয় অভিযোগ নিরসনের জন্য। EEOC এ ক্ষেত্রে অভিযোগকারীর সাথে কথাবার্তা বলে নির্ধারণ করে থাকে যে সুষ্ঠু সমাধানের জন্য কি করণীয়। অতঃপর মালিকের সাথে সমন্বয় চুক্তি করে থাকে। যদি মালিক EEOC কে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে EEOC মালিকের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিতে পারে। অনুকূল কার্যক্রম ধারণায় বলা হয়েছে যে, অতীতে চাকরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈষম্য ছিল যা দূর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাতে বৈষম্য দূর হয়। অনুকূল কার্যক্রমের জন্য প্রতিষ্ঠানকে নিশ্চিত করতে হবে যে, তাদের কার্যশক্তি সমাজের প্রতিনিধি, যেখানে ব্যবসায় পরিচালিত হয়। অনুকূল কার্যক্রম (Affirmative Action) ধারণা পোষণ করে সেই প্রতিষ্ঠানসমূহ, যে প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মীকে যথাযথ সমানভাবে বিবেচনায় আনতে পারেনি। তাই একটিমাত্র উপায় হলো অতীতের বৈষম্য সংশোধন করে তাদেরকে সমভাবে বিচার করতে হবে এবং চাকরির সুযোগ দিতে হবে। ১৯৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট Meritor Savings Bank Vs Vinson মামলায় বলে যে, যৌন হয়রানি "Title VII"-এর আওতায় যৌন বৈষম্য সৃষ্টি করছে। তখন থেকে যৌন হয়রানি পরিস্থিতি এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যেখানে একজন লোক একজন মহিলাকে যৌন উৎপীড়ন করে যিনি ঐ ব্যক্তির নিচের পদে বা সমপদে চাকরি করে। ১৯৯৮ সালে উচ্চ আদালত আবারো Oncale Vs Sundow her offshore, Inc.-এর মামলায় বলে যে, একই লিঙ্গের মধ্যে যৌন হয়রানি "Title VII"-এর আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য প্রতিবছর প্রতিষ্ঠান কর্মীদের এ জন্য অনেক অর্থ জরিমানা হিসেবে প্রদান করে। এটি শুধু অর্থের ক্ষতি তাই নয়, বরং এতে কর্মিসম্পর্ক এবং কর্মীদের নৈতিকতা নষ্ট করে দেয়। কোর্ট বিভিন্ন সময়ে ধারণা চিহ্নিত করেছে যা আচরণকে যৌন হয়রানিতে প্রভাবিত করে। যৌন হয়রানির দিকে প্রথম অগ্রসর হওয়াটা স্বাগতম না জানানো প্রকৃতির। যৌন হয়রানির বিষয়টি উহ্য বাা অপ্রকাশিত থাকে। যাকে নিপীড়নের জন্য লক্ষ্য করা হয়, তাকে বা তাদেরকে বুঝানো হয় যে, এটি হলো অপরাধমূলক ও অযৌক্তিক কাজ। দুজনকে এ জ্ঞান দেওয়া হলে, একজন হয়ত সত্যিই এটিকে অপরাধমূলক কাজ মনে করবে, অন্যজন এটিকে গ্রহণযোগ্য কাজ মনে করতে পারে। এটি হলো একটি আত্মগত ব্যাপার যা প্রকাশ করা একটা বোঝা হিসেবে গণ্য হয়। দ্বিতীয় ধারণাটি হলো নিপীড়নের প্রকৃতি সম্পর্কে। কোর্ট দু'ধরনের নিপীড়ন চিহ্নিত করেছে। একটি হলো- Quid Pro Quo, অন্যটি হলো বৈরীপরিবেশ (Hostile environment) । Quid Pro Quo- হলো ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ হলো- 'এটি হলো ওটার জন্য' (This for that) । অর্থাৎ এখানে যৌন উৎপীড়নকারী সংশ্লিষ্ট কর্মীকে ভয়ভীতি দেখিয়ে কিংবা গিফট দিয়ে অর্থাৎ একটা কিছু বিনিময় করে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। যদি যৌনতাকে প্রত্যাখ্যান করে তা হলে শাস্তির ভয় দেখানো হয়। আর অধিকাংশের মতে বৈরী পরিবেশে যৌন হয়রানি বা উৎপীড়ন হলো খুব সুক্ষ্ম প্রকৃতির। কার্যপরিবেশ যদি বৈরী হয় অর্থাৎ, যৌনতা সংঘটিত হওয়ার মতো হয়, তা হলে তো সেখানে এটি ঘটবেই। তাই এক্ষেত্রে মালিকদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ে যে, কার দ্বারা, কখন, কোথায়, কার সাথে যৌন নিপীড়ন করা হয়েছিল। যৌন নিপিড়ন ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠানকে চারটি নির্দিষ্ট সমস্যা নিয়ে কাজ করতে হয়। **প্রথমত:** শ্রমিক-কর্মী ও ব্যবস্থাপকগণ সচেতন নয় যে, যৌন নিপীড়ন কী এবং কীভাবে নিপীড়ন বা হয়রানির সৃষ্টি হয়। এ সকল সমস্যা দূর করতে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাপনা চ্যালেঞ্জ হাতে নিতে হবে। **দ্বিতীয়** সমস্যাটি হলো, যৌন হয়রানি রোধ করার জন্য প্রতিষ্ঠানের পলিসি থাকতে পারে কিন্তু অনেক কর্মী হয়ত এটি সম্পর্কে অসতর্ক কিংবা অনেকে জানেই না এতে কী লেখা আছে। এ সমস্যা মোকাবিলা করতে যে ব্যবস্থাপনা যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়, তা হলো প্রতিটি অভিযোগই একই ধরনের। যে কোনো প্রতিষ্ঠিত নীতির প্রয়োগে মিল থাকে কিন্তু ঘটনার পরিবর্তনশীলতা ও বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনাকে নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যায় ফেলে দেয়। এ বিষয়টি প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণ এটির প্রক্রিয়া ও পলিসির উপর জোর দেয়। কর্মীদের জানা প্রয়োজন বাস্তবে যৌন নিপীড়নের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানের অবস্থান কী এবং কীভাবে এটি প্রয়োগ করা হয়। যাই হোক, প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে এটির সফল প্রয়োগ করা যেতে পারে। যৌন নিপীড়ন ব্যবস্থাপনার **তৃতীয়** সমস্যা হলো, কর্মীরা যৌন নিপীড়নের ঘটনা সম্পর্কে রিপোর্ট করতে ভয় পায়। প্রায় অর্ধেক কর্মীর অবস্থা এ রকম যে, যৌন নিপীড়ন সম্পর্কে রিপোর্ট করার অর্থ ক্ষমতাবানের সাথে অথবা সরাসরি সুপার ভাইজারের সাথে সংঘর্ষে যাওয়া। কর্মীদের জানা প্রয়োজন যে, তাদের অভিযোগ গুরুত্বসহকারে নেয়া হবে। **চতুর্থ** সমস্যা হলো- কীভাবে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ সবচেয়ে উত্তম উপায়ে তদন্ত করা যায়। এটি ফলপ্রসূভাবে করার চ্যালেঞ্জ হলো ঘটনার দুটি দিকই আছে। দেখা গেল যে, ঘটনার সাক্ষী ও প্রমাণ কোনোটিরই লিখিত দলিল নেই। তদন্তকে চালিয়ে নেয়ার জন্য অন্যান্য কর্মীদেরকেও জিজ্ঞাসা করতে হবে, যাদের এ ব্যাপারে জানা আছে। অভিযোগের দ্রুত তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। এতে কর্মীদের মনে অনুকূল ধারণার জন্ম হবে এবং পুনরায় নিপীড়নের ঘটনা ঘটবে না।

পাঠ-৪.৩ যৌন হয়রানি ব্যবস্থাপনা কৌশল; বিদেশে জটিলতা; চাকরিতে আইনের ধারা

Strategy for Managing Sexual Harassment; Complication Abroad; Trends in Employment Litigation

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- যৌন হয়রানি ব্যবস্থাপনা কৌশল সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বিদেশে জটিলতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- চাকরিতে আইনের ধারা সম্পর্কে ব্যাখ্যা পারবেন।

যৌন হয়রানি বা উৎপীড়ন ব্যবস্থাপনা কৌশল

Strategy for Managing Sexual Harassment

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে কিছু কৌশল গ্রহণ করা আবশ্যক যেন কৌশলগতভাবে যৌন হয়রানির ঘটনার প্রভাব মোকাবিলা করা যায়। নিচে কতিপয় কৌশল উল্লেখ করা হলো:

১। প্রতিষ্ঠানকে সকল যৌন উৎপীড়ন বা হয়রানির ঘটনা তদন্ত করতে হবে। এ সকল ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞানহীনতা বা অজ্ঞতা আদালতে কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

২। সকল অভিযোগের দ্রুত ও ব্যাপক তদন্ত করতে হবে। সম্ভাব্য দায় নির্ধারণ করা জটিল, তবে সময় বুঝে কাটছাঁট করে শেষ করতে হবে।।

৩। নিয়োগকৃত তদন্তকারীকে অবশ্যই নিরপেক্ষ অপ্রভাবিত ও সুনির্দিষ্ট হতে হবে। কোম্পানিতে রাজনীতি ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব এড়াতে এটি হলো একটি জটিল বিষয়। অযথার্থ ও দুর্বল তদন্ত কোম্পানির সময় ও সম্পদই শুধু নষ্ট করবে না, ভবিষ্যতে কর্মীদের বিশ্বাস ও মনোবলও নষ্ট করবে।

৪। অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে পাল্টা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না মর্মে নিশ্চয়তা দিতে হবে। Title-VII এ এই সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের আচরণকে প্রতিহত করা হয়েছে, তা ঘটনা প্রমাণিত হোক বা না হোক। "Title-VII" এর বিধান কোনোভাবেই অমান্য করা যাবে না।

৫। অভিযুক্ত কর্মীর সাথেও ভালো ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি ঘটনারই দুটি দিক রয়েছে। শুধু মালিক কর্তৃক চাকরি থেকে ছাঁটাই করলেই ন্যায় বিচার হয়না। অভিযুক্তের নিকট থেকেও ঘটনা জানতে হবে যথাযথভাবে। অনেক সময় অভিযুক্তকে ছাঁটাই করা হয়ে থাকে। সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৬। উভয় পক্ষকে লিখিত বক্তব্যে সই করতে হবে এবং সমস্ত ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিতে হবে। কর্তৃপক্ষকে বুঝাতে হবে যে, তারা কোথায় দাড়িয়ে আছে। এটি তদন্তকারীর জন্য সহায়ক হবে এবং তারা (অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত) ঘটনার পরিবর্তন করতে পারবে না।

৭। যেখানেই ঘটনা ঘটবে, মালিককে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে পরিস্থিতি পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রনের জন্য। যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে দ্রুত, যেন ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা পুনরায় না ঘটে।

৮। চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠানকে একটি স্বচ্ছ ও সুন্দরভাবে বর্ণিত তদন্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। এ প্রক্রিয়াটি সমভাবে এ ধরনের ঘটনায় প্রয়োগ করতে হবে এবং প্রতিটি পদক্ষেপের দলিল তৈরি ও সংরক্ষণ করতে হবে। সংগৃহীত তথ্য গোপনীয়তার সাথে ব্যবহার করতে হবে, যেহেতু বিষয়টি খুব সংবেদনশীল।

বিদেশে জটিলতা
Complication Abroad

বিদেশে ক্রমাগতভাবে ব্যবসায় সম্প্রসারণের ফলে একটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তা হলো- কীভাবে বিদেশে যৌন নিপীড়ন নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অনেকে দেশের সংস্কৃতিতে কার্যক্ষেত্রে যৌন হয়রানি অপ্রত্যাশিত বরং এটি সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে। তখন এটি নৈতিকতার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় যে, কীভাবে এ আচরণকে সহ্য করা হবে যা অন্য সংস্কৃতিতে অন্যায় বলে গণ্য করা হয়।

কার্যক্ষেত্রে যৌন নিপীড়ন বা হয়রানি নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থাপকদের হাতে সবসময় ভুল আচরণ সংশোধনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ থাকেই, যদি তাদের এ সংক্রান্ত নির্দিষ্ট কোনো নীতি থাকে। এ ক্ষেত্রে আদালত বলে থাকে, অভিযোগকারী যেন দ্রুত বিষয়টি তাদেরকে অবহিত করে। সে ক্ষেত্রে মালিকের উপর দায়িত্ব এসে যায় এ সংক্রান্ত পলিসি দ্রুত বাস্তবায়ন করার জন্য। অর্থাৎ মালিককেও এ বিষয়ে রেহাই দেওয়া হয় না। যে কোনো কার্যক্ষেত্রেই যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটতে পারে। এটি কৌশলগতভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বচ্ছ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এতে সকল কর্মীকে নিশ্চিত করতে হবে যে, উচ্চ-কার্যসম্পাদনের জন্য কার্যক্ষেত্রে ভালো পরিবেশ বিরাজ করছে।

চাকরিতে আইনের ধারা
Trends in Employment Litigation

পূর্ববর্তী সকল আলোচনা থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, চাকরিতে আইনগত দিকটি খুবই জটিল এবং এর জন্য সতর্ক ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে চাকরিসংক্রান্ত আইনগত বিষয়ে বহু ধারা চালু করা হয়েছে যা চাকরি সম্পর্ক তৈরি ও প্রভাবিতকরণে কাজ করে। তাদের মধ্যে প্রথমটি হলো- বড় ধরনের বৈষম্য থেকে ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্ম বৈষম্যে আসা। যেহেতু আমাদের সমাজ ও কার্যক্ষেত্রগুলো অনেক সহনশীল হয়েছে এবং ব্যক্তিক পার্থক্য মেনে নিয়েছে, তাই অন্তত: মালিকদেরকে বৈষম্য বিরোধী আইন ভঙ্গের জন্য জরিমানা করা যেতে পারে। তাদের বৈষম্যের ধরন পাল্টেছে। EEOC বলেছে যে, বিশ শতকে বৈষম্যের গতি খুবই ব্যাপক ও অশালীন হয়েছে। এটি বর্তমানে খুবই সুক্ষ্ম আকার ধারণ করেছে যা কর্মীদেরকে কেবল বিচলিত করে। অনেক ক্ষেত্রে এটি প্রমাণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এখন শারীরিক নির্যাতন বা খারাপ ভাষায় গালি দেওয়ার চেয়ে অন্যভাবে বৈষম্য করা হয়; যেমন-দূরে রাখা, সিদ্ধান্তগ্রহণে অন্তর্ভুক্ত না করা, কর্মীদেরকে গুরুত্বহীন করে দেওয়া, কখনো এটিকে ক্ষুদ্র পরিসরে অসমতা বুঝায়। এ ধরনের আচরণের মধ্যে রয়েছে মুখের ভঙ্গিমা প্রকাশ, গলার স্বর, কর্মীদেরকে দল থেকে বাদ দেওয়া, সভায় যোগদান করতে না দেওয়া, জাতিগত দিক বিবেচনায় কর্মীকে বাদ দেওয়া, ইচ্ছাকৃতভাবে নামের ভুল করা ও সংশোধন করা, ছোট দলের সদস্য যখন বক্তব্য দেয়, তখন ব্যঙ্গ করা বা বক্তব্যের মাঝে বারবার বাধার সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ধারা হলো চাকরি সংক্রান্ত আইনকানুন কম্পিউটার ব্যবহার করে তৈরি ও জমা করা হয়। অধিকাংশ কর্মীরাই ই-মেইলের মাধ্যমে সহকর্মী, ক্রেতা, সুপারভাইজার, বিশেষ করে যারা বিভিন্ন স্থানে রয়েছে ইত্যাদি সকল পক্ষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা সহজ মনে করে। ই-মেইল ব্যবহারের অনেক সুবিধা রয়েছে। বিশেষ করে এটি পরবর্তীতে প্রয়োজনে কোনো রেফারেন্সের কাজ করে অর্থাৎ আর্কাইভের কাজ করে। তবে ই-মেইলের অসুবিধা হলো এতে একে অপরের সাথে আবেগপ্রবণ মন্তব্য বিনিময় করতে পারে যা ক্ষতিকর হতে পারে। আর একবার কোন কিছু বলা হলে, বা পাঠালে তা আর প্রত্যাহার করা যায় না।

তৃতীয় ধারাটি হলো- বর্তমান কর্মী ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের নিকট থেকে অভিযোগের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। তাদের অভিযোগ মালিকদের বিরুদ্ধে। মালিকগন কর্মীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে ও চাকরির অধিকার হরণ করে। নাগরিক অধিকার আইনের Title VII-তে কর্মীদের প্রতি দুর্ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং কর্মীদেরকে স্বীয় মালিকদের বিরুদ্ধে কেইস ফাইল করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এ সত্ত্বেও দুর্ব্যবহারের অভিযোগ বেড়েই চলেছে EEOC-তে। পূর্বের তুলনায় শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ অভিযোগ বেড়েছে।

কর্মীদের আইনগত বিষয়ে চতুর্থ ধারা হলো অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য মালিকদের প্রতি চাপ সৃষ্টি করা। আইনগত বিষয়গুলো কর্মী ও মালিক উভয়ের জন্য অর্থনৈতিক ব্যয়ের ব্যাপার EEOC উভয়ের মধ্যে মধ্যস্ততা শুরু করলে তা হবে দীর্ঘ সময়ের প্রক্রিয়া। মালিক পক্ষ থেকে দেখা হয় যে, অভিযোগের দ্রুত মীমাংসা হলে প্রতিষ্ঠানের লাভ, তা হলে তারা তা

দ্রুত নিষপত্তির জন্য ব্যবস্থা নেয়। দ্রুত নিষ্পত্তিতে খরচ কম হয়। আবার মালিক কিছু কিছু ক্ষেত্রে দ্রুত মীমাংসা চায় না। এতে তাঁরা বাধা দেয়, তার কারণ হলো- (i) এ ধারণা থেকে যে, প্রতিষ্ঠান ভুল করেনি। বরং অসৎ কর্মীকে সুবিধা প্রদান থেকে বিরত থাকা উচিত। (ii) অভিযোগে জড়িত কর্মীদের শাস্তি হওয়া দরকার। (iii) কর্মীদের আইন সংক্রান্ত খারাপ বিষয়গুলো অমীমাংসিত রাখার বিষয়ে প্রকাশিত হওয়ার ভয়। মালিক পক্ষ দেখে যে, অভিযোগের তাড়াতাড়ি মিমাংসা হলে তাঁরা লাভবান হলে, তা দ্রুত মীমাংসা করে। আর তা না হলে তাঁরা সহজে মীমাংসা করে না। উভয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করে চলে।

চূড়ান্ত ধারাটি হলো– কার্যক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ভাষার প্রয়োগ। কারণ, নাগরিক অধিকার আইন ১৯৬৪-এর Title VII-তে বিভিন্ন জাতিগত বৈষম্য রহিত করা হয়েছে। যে সকল মালিক কর্মক্ষেত্রে শুধু ইংরেজিকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে, তারা Title VII-আইন অমান্য করার ঝুঁকিতে রয়েছে। ২০০৭ সালে EEOC তে ৯৩৯৬টি জাতিগত বৈষম্যের জন্য অভিযোগ জমা পড়েছে যার মধ্যে অধিকাংশই ভাষার জন্য। যাই হোক, ইংরেজি ভাষার বিষয়টি কর্মীদের নিকট বোঝা মনে হলেও এটি রপ্ত করা তাদের জন্য মঙ্গলজনক। কারণ তাদের সহকর্মীদের অধিকাংশ, ক্রেতা, প্রতিনিধি, তত্ত্বাবধায়ক সকলেই যখন ইংরেজিতে কথা বলে, তখন তার জন্য ইংরেজি ভাষা রপ্ত করাটাই সুবিধাজনক।

শিক্ষার্থীর কাজ :	যৌন হয়রানির ব্যবস্থাপনা কৌশল সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

সারসংক্ষেপ:

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে কিছু কৌশল গ্রহণ করা আবশ্যক, যেন কৌশলগতভাবে যৌন হয়রানির ঘটনার প্রভাব মোকাবিলা করা যায়। নিচে কতিপয় কৌশল উল্লেখ করা হলো: ১। প্রতিষ্ঠানকে সকল যৌন উৎপীড়ন বা হয়রানির ঘটনা তদন্ত করতে হবে। ২। সকল অভিযোগের দ্রুত ও ব্যাপক তদন্ত করতে হবে। ৩। নিয়োগকৃত তদন্তকারীকে অবশ্যই নিরপেক্ষ অপ্রভাবিত ও সুনির্দিষ্ট হতে হবে। ৪। অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে পাল্টা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না মর্মে নিশ্চয়তা দিতে হবে। ৫। অভিযুক্ত কর্মীর সাথেও ভালো ব্যবহার করতে হবে। ৬। উভয় পক্ষকে লিখিত বক্তব্যে সই করতে হবে এবং সমস্ত ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিতে হবে। ৭। যেখানেই ঘটনা ঘটবে, মালিককে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে পরিস্থিতি পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রনের জন্য। ৮। চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠানকে একটি স্বচ্ছ ও সুন্দরভাবে বর্ণিত তদন্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। বিদেশে ক্রমাগতভাবে ব্যবসায় সম্প্রসারণের ফলে একটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তা হলো- কীভাবে বিদেশে যৌন নিপীড়ন নিয়ন্ত্রন করা যায়। অনেকে দেশের সংস্কৃতিতে কার্যক্ষেত্রে যৌন হয়রানি অপ্রত্যাশিত বরং এটি সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে। তখন এটি নৈতিকতার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় যে, কীভাবে এ আচরণকে সহ্য করা হবে যা অন্য সংস্কৃতিতে অন্যায় বলে গণ্য করা হয়। পূর্ববর্তী সকল আলোচনা থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, চাকরিতে আইনগত দিকটি খুবই জটিল এবং এর জন্য সতর্ক ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে চাকরি সংক্রান্ত আইনগত বিষয়ে বহু ধারা চালু করা হয়েছে যা চাকরির সম্পর্ক তৈরি ও প্রভাবিতকরণে কাজ করে। তাদের মধ্যে প্রথমটি হলো: বড় ধরনের বৈষম্য থেকে ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্ম বৈষম্যে আসা। দ্বিতীয় ধারা হলো: চাকরি সংক্রান্ত আইনকানুন কম্পিউটার ব্যবহার করে তৈরি ও জমা করা হয়। অধিকাংশ কর্মীরাই ই-মেইলের মাধ্যমে সহকর্মী, ক্রেতা, সুপারভাইজার, বিশেষ করে যারা বিভিন্ন স্থানে রয়েছে ইত্যাদি সকল পক্ষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা সহজ মনে করে। ই-মেইল ব্যবহারের অনেক সুবিধা রয়েছে। তৃতীয় ধারাটি হলো: বর্তমান কর্মী ও অসরপ্রাপ্ত কর্মীদের নিকট থেকে অভিযোগের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। তাদের অভিযোগ মালিকদের বিরুদ্ধে। মালিকগন কর্মীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে ও চাকরির অধিকার হরণ করে। নাগরিক অধিকার আইনের Title VII-তে কর্মীদের প্রতি দূর্ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং কর্মীদেরকে স্বীয় মালিকদের বিরুদ্ধে কেইস ফাইল করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এ সত্ত্বেও দূর্ব্যবহারের অভিযোগ বেড়েই চলেছে EEOC তে। পূর্বের তুলনায় শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ অভিযোগ বেড়েছে। চূড়ান্ত ধারাটি হলো: কার্যক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ভাষার প্রয়োগ। কারণ নাগরিক অধিকার আইন ১৯৬৪-এর Title VII-তে বিভিন্ন জাতিগত বৈষম্য রহিত করা হয়েছে। যে সকল মালিক কর্মক্ষেত্রে শুধু ইংরেজিকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে, তারা Title VII-আইন অমান্য করার ঝুঁকিতে রয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থ:

- Jeffrey A. Mello, Strategic Human Resource Management, 4th Edition, Cengage Learning, USA, First Reprint in India-2019.
- Robert L. Mathis et.al, Human Resource Management, 15th Edition, Cengage Learning, USA, 2017.

ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

১. আইনগত পরিবেশ বলতে কী বুঝায়?
২. সম পরিশোধ আইন বলতে কী বুঝায়?
৩. নাগরিক অধিকার আইন-১৯৬৪ ও ১৯৯১ সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
৪. চাকরির ক্ষেত্রে বয়সের বৈষম্য আইন-১৯৬৭ কী?
৫. পুনর্বাসন আইন-১৯৭৩ কী?
৬. পরিবার ও চিকিৎসা ছুটি আইন-১৯৯২ আলোচনা করুন।
৭. EEOC কী? অভিযোগ নিরসনে EEOC এর প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।
৮. কর্মীরা বৈষম্যের শিকার কিনা তা মালিকপক্ষ কীভাবে প্রমাণ করতে পারবে?
৯. যৌন হয়রানি বলতে কী বুঝায়?
১০. যৌন হয়রানি ব্যবস্থাপনা সমস্যা আলোচনা করুন।
১১. যৌন হয়রানি ব্যবস্থাপনার সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ উল্লেখ করুন।
১২. যৌন হয়রানি বা উৎপীড়ন ব্যবস্থাপনা কৌশল আলোচনা করুন।
১৩. চাকরিতে আইনের ধারা সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

•